ধর্মভিত্তিক দলগুলোর সংস্কার প্রসঙ্গে

আ হ সা ন মো হা ম্ম দ

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংস্কারের ধুম পড়েছে। প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন ধরণের সংস্কার প্রস্তাব আসছে বিভিন্ন মহল থেকে। প্রস্তাবগুলো প্রথমদিকে ব্যক্তি ও দলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও বর্তমানে তাতে রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রস্তাবও থাকছে। অচিরেই হয়তো আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোও সংস্কারের আওতায় চলে আসবে। এটি অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক নয়, কেননা বাংলাদেশের রাজনীতি এখন শুধু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্বারা প্রভাবিতই নয়, বরং জাতিসংঘ, কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্র ও ঋণদাতাসংস্থা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি নিয়ন্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। যাহোক, প্রধান দুটি দলের পাশাপাশি পূর্ববর্তী সংসদে আসন সংখ্যার হিসাবে চতুর্থ দলটিও সংস্কার প্রতিয়োগিতায় নাম লিখিয়েছে। তবে সংস্কারের মহোৎসবে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর নাম একোবারেই শোনা যাচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে আমাদের মিডিয়া ও সুশীল সমাজ যেমন চিন্তিত, তেমনি সাধারণ জনগণের মধ্যেও যে কিছুটা আলাপ-আলোচনা হচ্ছে না তা নয়। কেউ কেউ বলছেন, তাদের সংস্কার নিয়ে সরকারের নীতি নির্ধারকদের কোন মাথাব্যাথা নেই, কারণ রাজনীতিতে তারা বড় ফ্যাক্টর নয়। রাঘব বোয়ালেরা শুদ্ধ হয়ে গেলে এইসব কই-মাগুরেরা আপনা-আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। তবে সংস্কারের একটি সুযোগ যেহেতু এসেছে, সেহেতু এক যাত্রায় যদি সকলেরই হেদায়াত হয়ে যায়, তাহলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। সংস্কার প্রয়োজনয়ীতার প্রধান সূচকগুলো যথা - ক. পরিবারতন্ত্র খ. একক নেতৃত্ব গ. দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রহীনতা ঘ. দলীয় তহবিলের অব্যবস্থাপনা ও অস্বচ্ছতা - এগুলোর নিরিখে ইসলামী দলগুলোর কার অবস্থান কোথায় এবং কার কতটুকু সংস্কার প্রয়োজন তা এ নিবন্ধে বিশ্লেষণ করে দেখা হবে।

বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে গেলে তাদের উদ্ভব ও বিবর্তন সম্পর্কে জানা দরকার। এই দলগুলো আজকের অবস্থায় এসেছে মূলতঃ দুটি ধারা থেকে। বর্তমানের অধিকাংশ ইসলামি দলের সৃষ্টি হয়েছে আশির দশকে মওলানা হাফেজ্জী হুজুর রাজনীতিতে আসার পর থেকে। এর আগ পর্যন্ত আমাদের আলেম সমাজ ও পীর-মাশায়েখগণের প্রধান অংশটি রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না। হাফেজ্জী হুজুর রাজনীতিতে আসার পর থেকে তাঁরা একে একে তাঁদের স্বাতন্ত্র বজায় রেখে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হন। ভোট কিংবা সংসদে আসনের হিসাবে তাদের সমর্থন কিংবা প্রভাব তেমন না হলেও সাধারণ জনগণের মধ্যে সামগ্রিকভাবে দলগুলোর একটি প্রভাব রয়েছে। নির্বাচনের সময় জনগণ ইসলাম সহিষ্ণু ও ইসলাম বিদ্বেষী এই দুইভাগে রাজনৈতিক দলগুলোকে ভাগ করে ফেলে। এই সকল ক্ষুদ্র দলগুলো যে দিকে থাকে, সে পক্ষ ইসলাম সহিষ্ণু হিসাবে পরিচিতি পায়। এ কারণে বাতিল হওয়া ২০০৭ সালের নির্বাচনের পূর্বে আওয়ামী লীগের মত ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতির কট্টর বিরোধীকেও শায়খুল হাদীসের সাথে চুক্তি করতে হয়েছিল। খেলাফত আন্দোলন, খেলাফত মজলিশ, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, জাকের পার্টি, ইসলামী ঐক্য জোট ইত্যাদি এই ধারার ইসলামী দল। দলগুলো তৈরী হয়েছিল মূলতঃ পীর-মুরিদ ও শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ককে রাজনৈতিক পরিচয় প্রদানের মাধ্যমে। হাফেজ্জী হুজুর তাঁর মুরীদদের নিয়ে তৈরী করেন খেলাফত আন্দোলন, চরমুনাই এর পীর তৈরী করেন ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন এবং আটরশির পীর বানান জাকের পাটি। দলগুলো যেহেতু পীর-মুরিদ সম্পর্ক থেকে তৈরী হয়েছে, তাই এই ধারাটিতে পরিবারতন্ত্র ও একক নেতৃত্ব সমভাবে বিদ্যমান। পরিবারতন্ত্র এতো বেশী প্রবল যে, নেতার মৃত্যুর পর তাঁর জমিজমার মত দলও পূত্র-কন্যা (জামাই)দের মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। একই কারণে দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা বা নেতৃত্ব সৃষ্টির কোন ব্যবস্থাও দলগুলোতে

নেই। ব্যক্তির ইগো ও স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে দলগুলো বার বার একে অন্যের বিরুদ্ধে কাদা ছোড়া-ছুড়ি করেছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলাংশে বিভক্ত হয়েছে। এই ধারার দলগুলোকে সংস্কারের মাধ্যমে পীর মুরীদি থেকে প্রকৃত রাজনৈতিক সংগঠনে উন্নীত করতে পারলে তা আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে যেমন সমৃদ্ধ করতে পারবে তেমন জঙ্গীবাদ প্রতিরোধেও ভূমিকা রাখবে। উল্লেখ্য, জঙ্গীবাদ বিরোধী সামাজিক আন্দোলনে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। তাদের কেউ জঙ্গীবাদের মদদদাতা হিসাবে প্রমাণিত না হলেও এ ধারার কোন কোন নেতার অপরিণামদর্শী বক্তব্যের কারণে পুরো ইসলামী রাজনীতিকে জঙ্গীবাদের কালি মাখানো গেছে। এ ধারারই একজন নেতা রাজধানীতে মিছিলে শ্লোগান তুলেছিলেন, 'আমরা হবো তালেবান, বাংলা হবে আফগান'। এটি অবশ্য ৯/১১ এর অনেক আগের ঘটনা।

পাক-ভারত উপমহাদেশ স্বাধীন হবারও আগে ধর্মীয় রাজনীতির আরেকটি ধারার সৃষ্টি হয়। অর্ধ শতকের বেশী সময় ধরে সক্রিয় রাজনীতি চর্চার মাধ্যমে ধারাটি নিজেদেরকে কিছুটা ভালো অবস্থানে আনতে পেরেছে। এই ধারার মধ্যে জামায়াতে ইসলামী তুলনামূলকাভাবে বেশী জনসমর্থন অর্জন করেছে এবং ২০০১ এর নির্বাচনে তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। বাংলাদেশের সকল অঞ্চলেই দলটির উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন রয়েছে। প্রথম ধারার দলগুলির কর্মীরা মূলতঃ মাদ্রাসা শিক্ষিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এ ধারাটি আধুনিক ও মাদ্রাসা শিক্ষিতদের মধ্যে সমভাবে বিস্তৃত হয়েছে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলটির প্রাধান্য থাকায় মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী উচ্চ শিক্ষিত প্রজন্মের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত।

এখন দেখা যাক সংস্কার প্রয়োজনীয়তার সূচকগুলোর মাপকাঠিতে দলটির অবস্থান কোথায়। স্বাধীনতার আগে থেকেই দলটির মূল নেতৃত্বে ছিলেন একজন। তাঁর নাগরিকত্বের বিষয়টিকে দলটি যেভাবে নিয়েছিল, তাতে মনে করা হয়েছিল যে তাঁকে কেন্দ্র করেই দলের সব কিছু আবর্তিত হয় এবং তাঁকে ছাড়া দলটি টিকবে না। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে দলটির ভরাডুবির পর তিনি সমালোচনার মুখে পড়েন এবং পরবর্তীতে অবসর নেন। দলটির তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল দলের আমীর নির্বাচিত হন। পূর্ববর্তী বা বর্তমান আমীরের পরিবারের কেউ দলটিতে কোন উল্লেখযোগ্য পদে রয়েছেন বলে জানা যা না। দলটিতে সকল পর্যায়ে নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের খবর পত্র-পত্রিকায় দেখা যায়। গঠনতন্ত্র অনুসারে দলের রুকণ (সদস্য) সম্মেলন সকল বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। রুকনগণ প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে দলের আমীর ও সাংগঠনিক ইউনিটের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে মজলিশে সুরার সদস্যগণকে নির্বাচিত করেন। মজলিশে সুরা হচ্ছে দলের পার্লামেন্টের মত। তার সদস্যরা তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব করেন। আমীরকে সকল নীতি নির্ধারণী বিষয়ে শুরার সাথে পরামর্শ করতে হয়। কার্যকরী কমিটি শুরাতে বাজেট, কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি পেশ করে এবং শুরা সেগুলি পাশ করার পর তা বাস্তবায়ন করে। বছরে কমপক্ষে দুইবার মজলিশে শুরার অধিবেশন ডাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। শুরা দলীয় তহবিলের অডিট ব্যবস্থাপনাও করে থাকে। দলটিতে একক নেতৃত্বের বদলে অংশগ্রহণভিত্তিক নেতৃত্ব চালু রয়েছে। তাছাড়া কঠোরভাবে গঠনতন্ত্র মেনে চলার ব্যাপারে দলটির সুনাম রয়েছে। বিষয়টিকে এতোই গুরুত্ব দেয়া হয় যে সদস্য (রুকন) হবার জন্য গঠনতন্ত্রসহ দলীয় অন্যান্য পলিসি বিষয়ক বই-পত্র পড়ে তার উপর পরীক্ষা দিতে হয়। শুধু রাজনৈতিক দলের মধ্যেই নয় বরং অন্যান্য সংগঠনের মধ্যেও দলটি নিজেকে সর্বাধিক ডকুমেন্টেড বলে দাবী করে থাকে। এই একটিমাত্র দলেই সংগঠনের সকল পর্যায়ে নিয়মিত সদস্য সম্মেলন, মজলিশে সুরার সম্মেলন, নির্বাচন ইত্যাদি হয়ে থাকে। দলের অভ্যন্তরে মুক্তভাবে মতামত প্রকাশের বিষয়েও সংবিধানে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তবে বলা হয়েছে মুক্ত আলোচনা শেষে অধিকাংশের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। সম্ভবতঃ এ কারণে দলটিতে অন্তঃদলীয় কোন্দলের কোন কথা শোনা যায় না।

প্রধান চারটি দলের মধ্যে মাত্র এই একটি দলেই দলীয় তহবিল প্রতিবছর অডিটর দ্বারা অডিট করানো হয়। দলের সদস্য, কর্মী ও শুভাকাঙ্খীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত মাসিক চাঁদা, উশর ও জাকাত, অধঃস্তন সংগঠন থেকে প্রাপ্ত মাসিক নিসাব (কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত অংশ), জামায়াতের নিজস্ব প্রকাশনীর মুনাফা এবং জামায়াতের মালিকানাধীন সম্পত্তির আয়কে গঠনতন্ত্রে দলের অর্থের উৎস হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে । দলটির অন্য একটি প্রকাশনায় সদস্যগণের মাসিক চাঁদার হার উল্লেখ করা হয়েছে তার মাসিক আয়ের নূন্যতম পাঁচ শতাংশ হিসাবে। কেন্দ্রীয় ও জিলা জামায়াতের তহবিলের হিসাব প্রতি বছর কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা কতৃক নিযুক্ত অডিটর দ্বারা পরীক্ষা করাতে হয় এবং অডিট রিপোর্ট কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরায় পেশ করতে হয়। অডিট আপত্তি ওঠায় বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদেরকে বহিস্কার বা তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণেরও নজীর রযেছে। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে, সততাকে দলটির নেতা-কর্মীদের প্রধান যোগ্যতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

দেখা যাচ্ছে, সংস্কারের চারটি উদ্দেশ্যের সবগুলোই দলটিতে বিদ্যমান। এ কারণে তাদের সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অর্ধশতাব্দী ধরে সততা ও নিয়মতান্ত্রিকতার রাজনীতি করে আসার পরও দলটির সাফল্য কিন্তু উল্লেখ করার মত নয়। দলটির প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ ১০ শতাংশের মত এবং আসনের হিসাবে তা কখনই ২০টির বেশী হযনি। এককভাবে অংশ নেয়ায় তা তিনটিতে পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল। সততা, যৌথ নেতৃত্ব, গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির এই পরিণাম আশাব্যঞ্জক নয়। তাহলে কি সংস্কারের পর বর্তমানের জনপ্রিয় দলগুলোও একই দশা হবে? রাজনীতিতে দলটি সীমিত সাফল্যকে বিশ্লেষকগণ নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করেনঃ

১. দীর্ঘদিন পরাধীন থাকার ফলে এ দেশের মানুষ সমাজের উপরতলার মানুষদেরকেই নেতা হিসাবে দেখতে পছন্দ করে। কিন্তু, দলটির নেতা-কর্মীদের প্রায় সকলেই এসেছে সমাজের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে। একটি সফল সমাজ বিপ্লবের জন্য এ ধরণের নেতৃত্ব আদর্শ হলেও পুজিবাদী ভোটের রাজনীতিতে তা হয়তো খুব একটা আকর্ষণীয় নয়। আমাদের দেশে শুধু নির্বাচনে সময়েই যে রাজনীতিকদের প্রচুর অর্থ খরচ করতে হয়, তা নয়। নেতাদের বাসায় সব সময় এলাকার জনগণের ভীড় লেগে থাকে। তাদেরকে আপ্যায়নের মত আর্থিক সামর্থ্যও দলটির অধিকাংশ তৃণমূল নেতার নেই।

২. ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে দলটি এককভাবে অংশ নেয় এবং তাতে মাত্র তিনটি আসন পায়। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে দলটির ফলাফল নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে নানা রকম বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছিল। এ ধরণের একটি বিশ্লেষণে দলটির সীমান্ত এলাকার একজন কর্মীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছিল যে, তারা ভোট চাইতে গেলে বহু পরিবার থেকে তাদেরকে বলা হয়েছিল, যেহেতু তারা সৎ নেতৃত্ব চায়, ফলে দলটি ক্ষমতায় গেলে তাদেরকে ব্লাক (চোরাচালানী) করতে দেবে না, তাই তারা দলটিকে ভোট দিতে চায় না। সংস্কার প্রবক্তাদেরকে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।

৩. বাংলাদেশে বাজার অর্থনীতির প্রভাব দিনে দিনে বাড়ছে। বাজার অর্থনীতির অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে মিডিয়া, যা বিগত বছরগুলোতে দুর্নীতিবাজদের হাতে চলে যায়। মিডিয়ার সাথে দুর্নীতির যোগসূত্র যে কত গভীর তা বর্তমান দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে কিছুটা হলেও বেরিয়ে এসেছে। প্রধান দৈনিকগুলোর চারটির মালিক/সম্পাদক ও টিভি চ্যানেলগুলোর পাঁচটির মালিক দুর্নীতির অভিযোগ আটক হয়েছেন। যেহেতু এই দলটি সততাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে বলে দাবী করে এবং তার রয়েছে শক্তিশালী সাংগঠনিক ভিত্তি, তাই দলটির বিরুদ্ধে মিডিয়ার ঐক্যবদ্ধ অবস্থান অস্বাভাবিক নয়। মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোও তাদের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে

ভূমিকা রাখে। দলটির প্রতি জনগণকে বিরুপভাবাপন্ন করে তুলতে মিডিয়া সহায়তা করে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে।

৪. বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে বিদেশী শক্তির একটি ভূমিকা রয়েছে। পাশ্চাত্যের সাথে দলটির সম্পর্ক এবং দলটির প্রতি পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গী আসেলই কৌতুহলোদ্দীক। দলটিকে সাধারণভাবে পাশ্চাত্যের বিরোধী বলে মনে হলেও তারা সব সময় পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য কাজ করছে। অর্ধ শতাব্দী পূর্বেই দলটি ভোটের গণতন্ত্র, নারী নেতৃত্ব - ইত্যাদি গ্রহণ করে পাশ্চাত্য ধারার রাজনীতি করে আসছে। এ কারণে তাদেরকে আলেমগণের একটি অংশের কঠিন ফতোয়ার মুখেও পড়তে হয়েছে। বিষয়টিকে উপলব্ধি করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মুসলিম একনায়কদের সম্পর্ক বেশী ভালো - এ অভিযোগ ঘুচাতে দেশটি আগাগোড়া দলটিকে ইতিবাচকভাবে দেখে আসছে। বিগত সরকারের সময়ে যখন দলটিকে জঙ্গীবাদের সাথে জড়িত করে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রচারণার ঝড় উঠেছিল তখন বাংলাদেশে নিযুক্ত তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারী কে টমাস বলেছিলেন যে, দলটি মৌলবাদী বা জঙ্গীবাদী নয়, বরং এটি একটি গণতান্ত্রিক দল যা দলের ভিতরে বাইরে গণতন্ত্র চর্চা করে এবং বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আমেরিকা চায় না দলটি দুর্বল হয়ে পড়ুক, কেননা তাতে কট্টরপন্থী দলগুলো শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আবার তারা এও চায় না যে দলটি ক্ষমতালাভের মত যথেষ্ঠ জনসমর্থন অর্জন করুক, কেননা, তাতে দেশটির অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

৫. দলটির নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে তাঁরা দলীয় গন্ডীর বাইরে খুব একটা চিন্তা করতে পারেন না। দলের জন্য ব্যক্তি স্বার্থকে তারা কোরবানী করতে পারলেও জাতিকে নিয়ে ভিশনারী বক্তব্য বা কর্মসূচি দেশবাসী তাঁদের কাছ থেকে পায় নি। তাঁরা বলতে পারেন নি যে বাংলাদেশে একদিন দারিদ্র মিউজিয়াম তৈরী হবে, কিংবা সহজেই বাংলাদেশ জাপানের মত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হতে পারে। এ ধরণের ভিশনারী নেতৃত্ব অবশ্য অন্য দলেও নেই।

যে কারণে ধর্মভিত্তিক প্রধান দলটি জনসমর্থন অর্জনে খুব একটা সাফল্য লাভ করতে পারে নি, তার অনেকগুলোই সত্যিকার পরিশুদ্ধ দলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। যাঁরা রাজনীতিকে সংস্কার ও শুদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছেন তাদেরকে বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। তাছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের প্রয়েজনীয়তা নিয়ে জনমনে কোন সংশয় না থাকলেও, যে পদ্ধতিতে সরকার এবং নির্বাচন কমিশন এগোচ্ছে তাতে বিষয়টিকে নিয়ে নানা প্রশ্ন তৈরী হচ্ছে এবং পুরো সংস্কারকে বানচাল করার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা দেখা যাচ্ছে। এ জন্য নির্বাচন কমিশনের উচিৎ কোন কোন খাতে কি ধরণের সংস্কার তারা চায় তার একটি স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান করা এবং দলগুলোকে তদনুযায়ী তাদের গঠনতন্ত্র সংশোধন করতে বলা। দলগুলো তাদের সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুসরণ করছে কিনা নির্বাচন কমিশন তা একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করবে। উক্ত সময়ের মধ্যে দলগুলো তাদের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচন সম্পন্ন করবে এবং নির্বাচন কমিশন তা নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করবে। তাছাড়া দলীয় তহবিলের হিসাব ঠিকমত রাখা হচ্ছে কিনা এবং তা নিয়ম মত অডিট করা হচ্ছে কিনা ইত্যাদিও দেখা হবে। রাজনীতিকে সংস্কারের যে সুযোগ এসেছে তাকে ব্যবহার করে ভাঙ্গা-গড়ার খেলা না খেলে বরং বাংলাদেশের রাজনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করা হবে, এটিই সাধারণ নাগরিকদের প্রত্যাশা।